মাতৃভাষা চিন্তা প্রসঙ্গ ঃ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ড. রমেন্দ্র বর্মণ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

১. মাতৃভাষা চিন্তা প্রসঙ্গ ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভূমিকা □ ৭

২. পরিশিষ্ট □ ১৯
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাসঙ্গিক কবিতা, সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও অন্যান্য রচনার সংকলন)

এক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা □ ২১

(ক) ভাষা □ ২১
(খ) মাতৃভাষা □ ২২
(গ) স্বদেশ □ ২৩
(ঘ) ভারতের ভাগ্যবিপ্লব □ ২৫

দুই. 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ সমূহ □ ২৭

তিন. 'সংবাদ প্রভাকর'-এর অন্যান্য রচনা সমূহ □ ৪৯

মাতৃভাষা চিন্তা প্রসঙ্গ : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভূমিকা

পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত॥
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তুবোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট
হিতাহিত করিছ বিচার॥
যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥[১]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আশুবোধ্য নিরাভরণ এই উদ্ধৃতাংশটিকে কবিতার মর্যাদা দিতে অনেকেই হয়তো কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত। কিন্তু একে কবিতাই বলি আর পদ্যময় বুনন যাই যাই বলি না কেন এর মধ্যে ঝলমল করছে যে মাতৃ-ভাষা-সংরাগ তাকে সম্মান জানাতে আমরা বাধ্য। কারণ, 'বিনা স্বদেশীয় ভাষা মিটে কি আশা' ইত্যাদি প্রশ্ন ও আবেগের দ্বারা সে যুগের অনেকের মতো অল্পবিস্তর আমরাও আক্রান্ত হই অহরহ। বস্তুত, মাতৃভাষা-কেন্দ্রিক এই উচ্ছলিত আবেগ বা অনুভূতি স্বদেশ চেতনারই এক ভিন্নতর মুদ্রা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কথিত 'মাতৃসম মাতৃভাষা' নিশ্চয়ই আমাদের অস্তিত্বের দোসর, আমাদের শোণিত কণিকায় নিয়ত উপলব্ধি করি এর অন্তর্লীন উপস্থিতি, হয়তো আমাদের হৃদয়ের এবং মনন কল্পনার ঊর্মিময় দেশের কিংবা নৈঃশব্দ্য চূড়ার গাঢ়তর অভিজ্ঞান এক এবং একমাত্র মাতৃভাষাতেই লভ্য। মৃত্তিকা, জল, সূর্যালোক, বায়ু বা অন্য যে কোনও প্রাকৃতিক সম্পদের মতোই প্রায় অপরিহার্য এই মাতৃভাষা। ফলে, এর অভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত, সভ্যতার অগ্রগতি নিশ্চল, স্তব্ধ। আমাদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সমৃদ্ধি কল্যাণ, স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ মাতৃভাষার জঠরে অনুস্যূত। মাতৃভাষার বহতা স্রোতস্বিনীর অন্তহীন কলনাদে যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুরোধারূপে গণ্য। কারণ, মাতৃভাষা প্রীতি ঈশ্বরচন্দ্রের একটি তাৎক্ষণিক উপলব্ধি কিংবা একটিমাত্র কবিতারই বিষয়বস্তু নয়। 'স্বদেশ' নামক কবিতার একাংশে মাতৃভাষা সম্প্রসারণের যে মহৎ অভিলাষ ('বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা,/পূরাও তাহার আশা,/দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।') ব্যক্ত হয়েছে, সেই একই আবেগানুভূতির দ্বারা তাড়িত হয়ে 'ভাষা' নামক কবিতায় গুপ্ত কবি লেখেন—

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ-দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।

কোনমতে কেহ নাহি সমাদর করে॥

... ...

লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাঁকা।
সমাচার পত্রে লিখে কত যাবে রাখা।[২]

দেশজ ফল্গুর অক্লান্ত অনুসন্ধানী, ঈষৎ অভিমানী, কখনও কখনও প্রার্থনাপ্রাণ, ঘরোয়া এবং জর্নালধর্মী কবিতারচনায় অভ্যস্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই মাতৃভাষার মর্যাদা এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠা দানে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় দর্পিত যোদ্ধার বেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গুপ্ত কবির এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা-আন্দোলন-ইতিহাসের বিহঙ্গ-পরিক্রমা অপরিহার্য বলে মনে করি।

২

জনশ্রুতি এই নব্যবঙ্গীয়েরা (ইয়ংবেঙ্গল নামে সমধিক খ্যাত) ইংরেজিতে স্বপ্নদেখার মতো উদ্ভট ও হাস্যকর কর্মে একদা আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। যদিও 'মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি'—জাতীয় বলিষ্ঠ স্বীকৃতি সবার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি এবং এর মধ্যে যে উৎকট ইংরেজি ভাষাপ্রীতি জড়িত তা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়—কিন্তু ইংরেজি ভাষাশিক্ষার আগ্রহ একসময় কিরূপ গভীরমূল হয়েছিল তার একটি উদ্ধৃতিযোগ্য নজির হয়তো উপরের এই ঘটনা। অবশ্য বিদেশী ভারতপথিকদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের আত্মজাগরণে এবং বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রূপদী মহিমায় যেমন তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি দেশীয় ভাষার চর্চা ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্বের কথাও সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন—"শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে বাহনরূপে গ্রহণ সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশনের পাদরী ড. জসুয়া মার্শম্যান ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ 'হিন্টস' নামক এক শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে ইহার অনুকূল আলোচনা করেন।"[৩]

শিক্ষার মাধ্যমরূপে দেশীয় ভাষাকে গ্রহণ ও প্রচলনের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রধান অংশটা বরাবরই দ্বিধান্বিত মনোভাব দেখিয়েছেন, ফলে লর্ড বেণ্টিক ১৮৩৫-র 'মিনিটে' উচ্চশিক্ষার প্রধান বাহন-রূপে ইংরেজির পক্ষে রায়দান করে বলেন— "His Lordship in Council directs that all the funds which these reforms will leave at the disposal of the Committee be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English literature and Science through the medium of the English language; and His Lordship in Council requests the Committee to submit to Government with all expedition, a plan for the accomplishment of this purpose."[৪]

অবশ্য এই একদেশদর্শী সিদ্ধান্তকে শিক্ষাকমিটি একবছরের মধ্যেই পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হন এবং মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্বকে কুণ্ঠিত স্বীকৃতি জানিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখেন—"We are deeply sensible of the importance of

encouraging the cultivation of the vernacular languages. We do not conceive that the order of the 7th March precludes us from doing this, and we have constantly acted on this construction............We conceive the formation of a vernacular literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed."[৫]

কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতদের একাংশ সর্বদাই দেশীয় ভাষার সপক্ষে উচ্চকণ্ঠ। অগ্রগণ্য পণ্ডিত উইলসন নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন যে, "আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা উচিত, জাতীয় সাহিত্য কেবল জাতীয় ভাষার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞানবিদ্যার চর্চা যদি কেবল বিদেশী ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে সেটা সমাজের একদল মুষ্টিমেয় লোক, যাঁদের অর্থ ও অবসর দুই-ই আছে, তাঁদেরই বিলাসের বিষয় হয়ে ওঠে। একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মৌলিক পার্থক্য এত বেশী যে ইংরেজি কখনই এদেশের শিক্ষার প্রধান বাহন হতে পারে না।"[৬]

এক্ষেত্রে (মাতৃভাষা চর্চা ও প্রসার) সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, হিন্দুকলেজ পাঠশালা, তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়গুলি প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। রামমোহন রায় (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, বেদান্ত গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা করে মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর অনুরাগের পরিচয় দেন) বেথুন সাহেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যমের পরিচয় দেওয়া কিংবা মূল্যায়ন করা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সম্ভব নয়। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান তাঁদের বিচিত্র কর্মৈষণা ও মননসাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে এককভাবে আলোচিত না হলে তাঁদের প্রতি অবিচারের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

আরেকটি শুভলক্ষণ এই যে, দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রশ্নে, প্রাচীনপন্থী গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ঈর্ষণীয় ভাবে নব্যতন্ত্রী ইয়ংবেঙ্গলদের কেউ কেউ একত্রিত হতে পেরেছিলেন। বস্তুত, মাতৃভাষা অনুশীলনের প্রথম এবং প্রধান আশীর্বাদই হলো মাতৃভাষা আমাদের সংস্কারের সীমাবদ্ধ পাঁচিলটাকে ভেঙে সেতুবন্ধনের উদার আয়োজন করে। মাতৃভাষার মুকুরেই মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা দীপ্যমান। আমাদের অস্তিত্বের ও চেতনার শাশ্বত ঘোষণাগুলি মাতৃভাষাতেই লভ্য। ১৮৪০-এ হিন্দু কলেজ পাঠশালার উদ্বোধন দিনের বক্তৃতায় পঠিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন—

"সংস্কৃতভাষাবলম্বন না করিয়া গৌড়ীয় ভাষাতে বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওনের প্রয়োজন এই যে সংস্কৃত প্রচলিত লৌকিক ভাষা নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষা এবং অতিশয় কঠিন, ও তদুপার্জন বহুকাল ও বহুপরিশ্রম সাধ্য, অতএব দেশান্তরীয় ভাষাতে সাধারণের বিদ্যা উপার্জন যেরূপ ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দোষ, তাহা সকল সংস্কৃত ভাষার অবলম্বনে বর্ত্তিবার সম্ভাবনা, এ কারণ দেশস্থসাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, এই হেতু এতৎ পাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয়ভাষা দ্বারা বিদ্যোপার্জন করান যাইবেক, অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালনপালন দ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাতপদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে,

অতএব ইহাতে তাহাদিগের অপ্রাপ্ত সংস্কার যে ভাষান্তর তদভ্যাসের শ্রম নিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগি বিদ্যা অভ্যাস করিবেক।"[৭].......

ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্র এবং রিচার্ডসনের অন্যতম প্রিয়ছাত্র রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারাও একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। মাতৃভাষা চর্চার বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর আশ্চর্য সংবেদী কণ্ঠের ঘোষণায় পাওয়া যায়— "এদেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি ইংরাজী ভাষার অনুশীলনী যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষাদ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে!

...........ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরমপ্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ওই পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা এই কথা কহেন তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না।.......ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যাশিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতি পাত্র সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশব কালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতাপিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তনদুগ্ধ যদ্রূপ অন্যসকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে।....... পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্তি হয় না, এবং আত্মভাষার অনুশীলন বিনা কোনো দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই।"[৮]

পাঠ্যপুস্তক রচনা, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা, সভাসমিতি গঠন, বক্তৃতা প্রদান, সাময়িক পত্রিকার মারফতে জনমত গঠন ইত্যাদি বহুধা কর্মের মাধ্যমে জাতির সার্বিক উজ্জীবন প্রয়াস ত্বরান্বিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাবের যথার্থ ভূমিকা রচিত হয়েছিল।

৩

ফলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সপক্ষে দিনের পর দিন প্রচার চালানো একক বা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। গুপ্ত কবির জীবন ও কর্মধারায় দোলাচল বৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি একনিষ্ঠ দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। বঙ্গরঞ্জিনী সভার সম্পাদকরূপে 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পত্রটিকে তাঁর মাতৃভাষা সচেতনতার প্রথম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যায়। বঙ্গরঞ্জিনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার চর্চা ও প্রসার সাধন। গুপ্ত কবির ঘোষণাটি স্বতঃ উদ্ধৃতিযোগ্য—'অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণ

দ্বারা সভাভঙ্গে ভীত হইয়া এই স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্তু ধর্মদ্বেষী নাস্তিক মতাবলম্বী বিবেচনাশূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্ব প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা তস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না।.........”[৯]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মাতৃভাষা প্রীতি যেরূপ উগ্র আকারে প্রকাশ পেয়েছে তা অনেকের হয়তো পছন্দ হবে না; কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় আমরা দেখব এই ভাষাপ্রীতি ও আবেগের সঙ্গে মননচিন্তা এবং যুক্তির শোভন পরিণয় সাধিত হয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষাকে প্রচলন করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা দেখা যাচ্ছে 'সংবাদ প্রভাকর' একে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে আগ্রহী। শিক্ষা-সৌধের স্থায়িত্ব, ব্যবহারোপযোগিতা এবং সৌন্দর্য যে মাতৃভাষার উপর মূলত নির্ভরশীল তা 'সংবাদ প্রভাকর' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছে। শিক্ষার আলোককে যদি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয় এবং শিক্ষাকে যদি সাধারণের সম্পদে পরিণত করতে হয় তাহলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভূমিকা 'সংবাদ প্রভাকর'-এর বেদনার এবং সমালোচনার কারণ হয়েছে— “যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, 'ইয়ংবেঙ্গল' যুবকদলেরা স্বদেশের কল্যাণকারী বলিয়া সর্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়? তাঁহারদিগের ভাষার শিক্ষা-গুরু মহাশয়ের নিকট পরম কল্যাণীয় পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা? তাহা সন্দেহের বিষয়; অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা এবং ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাঁহারদিগের মঙ্গলচেষ্টার আদিসূত্রেই দোষ পড়িতেছে,.....”।[১০]

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষত ইংরেজি শিক্ষার মোহান্ধতা মাতৃভাষার বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে। 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৪৮ সালে—এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন—“এই বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের স্থানে স্থানে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে তত্তাবৎ উচ্ছেদ করিয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিতা করণাভিপ্রায়ে কতিপয় বিলাতীয় ব্যক্তি বাহুল্যরূপে ইংরাজী ভাষা প্রচার নিমিত্ত রাজ-ভাণ্ডার হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের ঐ দুরাশা কখনই সিদ্ধি হইবেক না, একজাতির ভাষা পরিবর্তন করা সামান্য কার্য্য নহে, যুগ যুগান্তর মন্বন্তরযোগে ঐশ্বরিক কোন ঘটনার দ্বারা এই জগতের সমুদয় শোভার বিশেষ ভাবান্তর ভিন্ন ঐ কার্য নির্ব্বাহ হয় না, কতিপয় শ্বেতকান্তি এই রাজ্যের রাজ কার্য্যের ভার গ্রহণ পূর্বক ঐ অসাধ্য কার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া পিপীলিকার সিন্ধু সন্তরণের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম করিতেছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট একাল পর্য্যন্ত স্বজাতীয় ভাষার বিস্তারজন্য টাকা ব্যয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষোপকার কি হইয়াছে তাহা আমরা বল্লিতে পারি না, ঐ টাকা যদ্যপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনার্থে ব্যয় করিতেন তবে এতদিনে এই দেশের ভাষার লাবণ্য বিকীর্ণ হইত, দেশীয় ভাষার পুস্তকাদির কিছুমাত্র অভাব থাকিত না, শিক্ষকও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যাইত,......... বর্ত্তমান অধিকারী ব্রিটিস জাতি যদ্যপি বঙ্গভাষানুশীলনের প্রতি উচিতমত যত্নানুরাগ ও অর্থব্যয়